ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 05. No. 01. February 2011

ব্রিটিশ যুগে পাবনা জেলার ঐতিহাসিক বিদ্রোহ : একটি পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মদ ইদ্রিস*
মোঃ মারুফ বিল্লাহ**

সারসংক্ষেপঃ ভূমিকা পাবনা একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জনপদ। পদ্মা-যমুনার নদীর মিলন মোহনায় গড়ে ওঠা এ ভূখণ্ড ইতিহাসের নানা উপাদানে সমৃদ্ধ। বাংলায় বৃটিশ শাসনের গোড়া থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট কর্তৃক উচ্চহারে খাজনা আদায় ও কৃষকদের ওপর নানাবিধ জুলুমবাজি চলতে থাকে। কৃষকরাও শুরু থেকেই তাদের স্বার্থ বিরোধী সরকারি এসব পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। এ সময় বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় পাবনা জেলার কৃষকদের অনেকে চাষাবাদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করলে একদিকে গ্রামীণ অর্থনীতির অবনতি ঘটতে থাকে অন্যদিকে এ সময়ে বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেখা দিলে দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটন এদেশে একটি স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করে। এমতাবস্থায় কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘনীভূত হয় এবং তা সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়। এতে বাংলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। এই ধারাবাহিকতায় রাজশাহী জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে এবং চুরি, ডাকাতি, ফকির-সন্ন্যাসীদের উপদ্রব বৃদ্ধি পেলে ঢাকা কেন্দ্রিক প্রশাসনের পক্ষে এ অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অতঃপর প্রশাসনিক কারণে স্থানটির গুরুত্ব ও জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রথমে আটটি থানা নিয়ে পাবনা জেলা গঠিত হয় এবং ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে এটি পূর্ণাঙ্গ জেলায় পরিণত হয়।

পাবনা জেলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ জেলার প্রজাগণ নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতির। কিন্তু প্রয়োজন মুহূর্তে তাঁরা যে কত দূর্বার হতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত নীল ও কৃষক বিদ্রোহে। এর মূল কারণ এদের অধিকার সচেতনতা এবং ন্যায়ের কারণে দ্রুত সংঘবদ্ধ ও দূর্জয় সাহসী হওয়ার ক্ষমতা। উপরিউক্ত ঐতিহাসিক বিদ্রোহসমূহে এ জেলার প্রজাগণ যে ভূমিকা রেখেছেন তা ইতিহাসের পাতায় চির অম্লান হয়ে রয়েছে। কাজেই বৃটিশ যুগে সংঘটিত পাবনা জেলার ঐতিহাসিক বিদ্রোহ বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য প্রবন্ধে বৃটিশ যুগে পাবনা জেলায় সংঘটিত ঐতিহাসিক ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ ও প্রজা বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।]

ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষক শ্রেণীর বিদ্রোহ ঘটে, সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে এ বিদ্রোহ "ফকির-

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, সাঁথিয়া মহিলা কলেজ, পাবনা।
** পি-এইচ.ডি গবেষক,ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ"[১] নামে পরিচিত। আন্দোলনকারী ফকিররা ছিলেন মাজরিয়া সুফি তরিকার অনুসারী। এ সুফি তরিকা সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে "শাহ্ সুলতান হাসান সুরীয়া বুরহানার"[২] নেতৃত্বে বাংলায় প্রসার লাভ করে। আর সন্ন্যাসীরা ছিল বেদান্তীয় হিন্দু যোগী এবং একদণ্ডী সন্ন্যাসবাদের গিরি ও পুরী গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ফকির ও সন্ন্যাসীরা যথাক্রমে খানকাহ্ ও আখড়ায় বাস করত। সুফি ফকির ও যোগী সন্ন্যাসীদের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ও ধর্মাচারণে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। এ সাদৃশ্য ও একাত্মতা কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে তাঁদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে সহায়ক হয়েছিল।[৩]

ফকির ও সন্ন্যাসীরা তাঁদের অনুসারী ও সহমর্মী জনসাধারণের নিকট থেকে দান গ্রহণ করে তার ওপর ভিত্তি করেই জীবনধারণ করতেন। কোম্পানি শাসকেরা দেশের ধর্মীয় রীতিনীতি ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে মোটেও ওয়াকিবহাল ছিল না ; আর সে কারণেই ফকির সন্ন্যাসীদের দান গ্রহণকে তারা জনসাধারণের নিকট থেকে অননুমোদিত অর্থ আদায় বলে মনে করত। কাজেই কোম্পানি সরকার ফকির সন্ন্যাসীদের সংগঠিত দল কর্তৃক দান গ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। একই কারণে ফকির-সন্ন্যাসীরা ফিরিঙ্গি শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে।[৪]

১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ শুরু হয়। ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে তা পূর্ণাঙ্গ বিদ্রোহের রূপ নেয় এবং জোরদার হয়ে ওঠে। ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সংগঠক ও নেতা ছিলেন মাদারিয়া তরিকার সুফি "ফকির মজনু শাহ"[৫]। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তিনি বিহারভিত্তিক মাদারিয়া সুফি তরিকার নেতা হিসেবে শাহ্ সুলতান হাসান সুরীয়া বুরহানার স্থলাভিষিক্ত হন। এ সময়ে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দানে তাঁর খলিফা ছিলেন সুফি সাধক মুসা শাহ্ , চেরাগ আলী শাহ্ , পরাগল শাহ্ , সোবহান শাহ্ , করিম শাহ্ প্রমুখ। ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহে সম্পৃক্ত জনৈক বোজপুরী ব্রাহ্মণ ভবানী পাঠক তখন মজনু শাহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ছোটখাট জমিদার দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়। তিনি বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের নেতৃত্ব দেন বলেও অবগত হওয়া যায়। ফকির-সন্ন্যাসীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল কোম্পানির অফিস, কুঠি, ফিরিঙ্গি শাসকদের অনুগত জমিদারদের বাড়ী-ঘর, কাচারি এবং শাসকদের অধীনে কর্মরত আমলাদের আবাসস্থল, অফিস ও কাচারি প্রভৃতি। এসব আক্রমণে তারা যুদ্ধ তরবারি, বর্শা ও বল্লম, বন্দুক, অগ্নি নিক্ষেপক যন্ত্র, হাওয়াই ও ঘূর্ণায়মান কামান প্রভৃতি।[৬]

ফকির-সন্ন্যাসীরা সর্বপ্রথম ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে বাকেরগঞ্জে কোম্পানির বাণিজ্য কুঠি আক্রমণ করে। তারা তথাকার কুঠিয়াল ক্যালীকে কয়েকদিন আটক করে রাখে এবং কুঠি লুণ্ঠন করে। ঐ বছর অতর্কিত আক্রমণ করে তারা ঢাকা কুঠি দখল করে নেয়। ঐ একই বছর ফকির সন্ন্যাসীরা রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়ায় অবস্থিত কোম্পানির কুঠি আক্রমণ করে কুঠিয়াল বেনেটকে আটক করে। বন্দি অবস্থায় বেনেটকে পাটনায়

পাঠানো হলে সেখানে তাকে হত্যা করা হয়। ইতোমধ্যে ফকির সন্ন্যাসীদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং এদেশের দরিদ্র জনসাধারণ ও নির্যাতিত-নিপীড়িত কৃষক শ্রেণী দলে দলে তাঁদের পক্ষে যোগ দিয়ে তাঁদের শক্তিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের দিকে সমগ্র বাংলায় এ বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে রংপুর, রাজশাহী, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ও কুমিলণ্ঢা জেলায় ফকির সন্ন্যাসীদের আক্রমণ তীব্রতর হয়ে ওঠে। এমনকি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে এ বিদ্রোহ দাবানলের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় কোম্পানি সরকার উত্তরবঙ্গে বিদ্রোহীদের প্রতিহত করার জন্য ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে ক্যাপ্টেন ম্যাকেঞ্জির অধীনে ইংরেজ বাহিনী প্রেরণ করে। ইতোমধ্যে মালদহের ইংরেজ রেসিডেন্ট বাবওয়েল কর্তৃক মার্টলের নেতৃত্বে প্রেরিত একটি ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহীদের নিকট পরাজিত হয় এবং সেনাপতি মার্টল নিহত হয়। এদিকে ক্যাপ্টেন ম্যাকেঞ্জির নেতৃত্বে প্রেরিত বাহিনীর আগমণের সংবাদ পেয়ে বিদ্রোহীরা নেপালের দিকে পশ্চাদপদ হয় বলে কোম্পানির একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়।[৭]

এরপর ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে থেকে ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে পর্যন্ত ফকির সন্ন্যাসীরা প্রধানত ভারতের বিহার, বেনারস, পূর্ণিয়া জেলায় এবং বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, কুমিলণ্ঢা ও চট্টগ্রাম জেলায় আক্রমণ অব্যাহত রাখে। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহীরা মজনু শাহের নেতৃত্বে রংপুর, রাজশাহী ও বগুড়া জেলায় কোম্পানির বাণিজ্য কেন্দ্র ও আবাসন আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। একই সময় তিনি কয়েক'শ সশস্ত্র অনুসারী নিয়ে রাজশাহীতে অবস্থিত কোম্পানির রাজস্ব অফিস আক্রমণ করে কিছুদিন দখল করে রাখে এবং তথাকার সংগৃহীত সমুদয় অর্থ হস্তগত করে।[৮]

১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহীরা ভারতের পূর্ণিয়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম, জলপাইগুড়ি ও বাংলাদেশের যশোর, কুমারখালী, ময়মনসিংহ, সিলেট, ঢাকা, রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় আক্রমণ পরিচালনা করে। ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে বগুড়া, রাজশাহী, দিনাজপুর ও চট্টগ্রাম ফকির-সন্ন্যাসীদের আক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করে।[৯] বগুড়া জেলার অদূরে মহাস্থানগড়ে (মস্তান গড়ে) ফকির নেতা মজনু শাহ্ একটি দূর্গ নির্মাণ করে সেখান থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও জমিদারদের উত্যক্ত ও লুটতরাজ করত বলে জানা যায়। ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে ২৬ জুন বগুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. ফ্রান্সিস গণ্ঢাডউইন কর্তৃক দিনাজপুরের রাজস্ব কাউন্সিলের কাছে লিখিত পত্রেও মজনু শাহ ও তাঁর দূর্গের কথা উলিণ্ঢখিত আছে।[১০] অতঃপর ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে পর্যন্ত ফকির-সন্ন্যাসীরা এ এলাকায় আক্রমণ অব্যাহত রাখে।

এ সময়ে পাশ্ববর্তী জেলা হিসেবে পাবনা জেলার বিভিন্ন এলাকায় ফকির-সন্ন্যাসীদের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ক্যাপ্টেন রেনেলের বিবরণ থেকে পাবনা জেলায় ফকিরদের তৎপরতা সম্বন্ধে জানা যায়। তাঁর প্রতিবেদনে উলিণ্ঢখিত আছে যে, এ সময় সিরাজগঞ্জের নিকটে ফকিররা খুব তৎপর ছিল। এ ফকিরদের দমনের জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে লেফটেন্যান্ট টেলালের নেতৃত্বে দুটি সিপাহী দল প্রেরণ করা হয়।[১১] পাবনা জেলার (বর্তমান সিরাজগঞ্জ) রায়গঞ্জ থানার প্রসিদ্ধ স্থান

নিমগাছিতে ফকির নেতা মজনু শাহের একটি আস্তানা ছিল বলে জানা যায়।[১২] পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার অধীন সন্ন্যাসীবাধা, ফকিরকান্দী, শ্রীনিবাসদিয়া, সিংহাসন, সাফলণ্ঢা, শিবপুর প্রভৃতি গ্রামের নাম ও অবস্থানদৃষ্টে তাঁদের অবস্থান নিশ্চিত হওয়া যায়। সন্ন্যাসীবাঁধা গ্রামের অবস্থানদৃষ্টে এটি যে প্রকৃতই সন্ন্যাসীদলের আশ্রয়স্থল ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।[১৩] বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলা সদর থেকে প্রায় চার মাইল পশ্চিমে বারুহাস ইউনিয়নের বিনোদপুর মৌজায় বেঙ্গুলা নদীর পশ্চিম তীরে সন্ন্যাসীর ভিটা নামে একটি ভিটার অস্তিত্ব বিদ্যমান। এ অঞ্চলের জনসাধারণ আজও এটিকে সন্ন্যাসীর ভিটা নামেই চিনে থাকে। এছাড়া এ ভিটার পশ্চিম-উত্তর কোণে পুকুরের পাড়ে বটগাছের শিকড় দ্বারা আবৃত ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি মঠের অস্ড়িত্ব এখনও বর্তমান। এসব ধ্বংসাবশেষ এ স্থানে ঐতিহাসিক সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।[১৪] এছাড়া পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার নঁওগা, সমাজ প্রভৃতি গ্রামে এবং বর্তমানে সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ ও রায়গঞ্জ উপজেলায় শাহ্ মাদার (র.) এর অনেক ভক্ত অদ্যাবধি দেখা যায়। এরা একদিকে নিজেদের মাদার ফকির বলে প্রচার করে, বংগীল আলখেলণ্ঢা পরিধান করে মাথায় জট বা লম্বা চুল রাখে, কেউ কেউ হাতে লোহার বালা ও তামার চিমটা ব্যবহার করে, অপরদিকে কৃষিকাজও করে। এদের মধ্যে তামাক, গাঁজা, ভাঙ প্রভৃতি নেশাও দেখা যায়। কেউ কেউ নিজেদের নাড়ার ফকির বলে পরিচয় দিয়ে থাকে।[১৫] ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে ফকির নেতা মজনু শাহের মৃত্যুকাল পর্যন্ত পাবনা জেলা ও পাশ্ববর্তী জেলাসমূহে এ বিদ্রোহ অব্যাহত ছিল বলে অবগত হওয়া হয়।

মজনু শাহের মৃত্যুর পর তাঁর যোগ্য প্রতিনিধি মুসা শাহ্ , চেরাগ আলী শাহ্ , পরাগল শাহ্ , সোবহান শাহ্ , মাদার বখ্স, জরি শাহ্ , করিম শাহ্, কৃপানাথ, রওশন শাহ্ , অনুপ নারায়ণ ও শ্রী নিবাস ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে পর্যন্ত ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ অব্যাহত রাখে। তবে মজনু শাহের মৃত্যুর পর এ বিদ্রোহ ধীরে ধীরে তার সঠিক দিকনির্দেশনা ও গতিশীলতা হারাতে থাকে। অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দশকে বিদ্রোহ অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং সমগ্র বাংলায় বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৬]

নীল বিদ্রোহ

বৃটিশ যুগে পাবনা জেলায় যে সকল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তন্মধ্যে নীল বিদ্রোহ অত্যন্ত গুর"ত্বপূর্ণ। এ বিদ্রোহে পাবনা জেলার ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষ তথা উপমহাদেশে নীলের চাষ প্রচলিত ছিল তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় ভারতীয় ভেষজ বিজ্ঞানের বিভিন্নগ্রন্থে, প্রাচীন প্রতিমূর্তির বর্ণে, অঙ্কিত পট ও চিত্রসমূহে।[১৭] সে সময়ে কিভাবে নীলচাষ হতো তা বিস্তারিত জানা যায় না। তবে যতদূর জানা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপণ্ঢবের ফলে ইংল্যান্ডে বস্ত্রশিল্পের প্রসারতা লাভ করে। এ সময় রঙের জন্য 'নীল'[১৮] একটি মূল্যবান উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়। এমতাবস্থায় প্রয়োজনীয় নীলের সন্ধানে ইংরেজ নীলদস্যুদের বাংলাদেশে আগমন হয়।[১৯]

এদেশে আধুনিক পদ্ধতিতে নীলচাষ ও এর ব্যবহারের প্রবর্তন করেন 'লুই বন্ড'[২০] নামক একজন ফরাসি বণিক। লুই বন্ডের পরে বাংলাদেশে নীল উৎপাদনের জন্য নীলকুঠি স্থাপন করেন মি. টাপট। তিনি ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে রূপদিয়াতে কুঠি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই মি. সি. ডবিণ্ডউ. শেরিফ জোড়াদহে ও ১৯৯৬ খ্রীস্টাব্দে মি. জন রিভ্স ও শেরিফের যৌথ মালিকালায় সিন্দুরিয়াতে এবং মি. টাপট মহম্মদশাহীতে একটি করে নীলকুঠি স্থাপন করেন।[২১] লুই বন্ডের পর ক্যারল বণ্ডু নামক একজন ইংরেজ হুগলী জেলার এক গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে একটি নীলকুঠি স্থাপন করেন বলে জানা যায়।[২২] তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে নীলচাষে ব্যাপক মুনাফার কথা অবহিত করেন এবং অনতিবিলম্বে নীলের কারবার করার জন্য আহ্বান জানান এবং একই সঙ্গে এ ব্যবসার প্রসার-প্রয়াসে সহায়তা করার অনুরোধ জানান।[২৩] পরবর্তীতে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে দহকোলা, আলমপুরে ফার্গুসন ও মে সাহেব এবং মহেশপুর এলাকায় মি. টেলর অনেকগুলি নীলকুঠি স্থাপন করেন। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে বার্কার সাহেব চুয়াডাঙ্গার নিশ্চিন্তপুরে এবং মি. এন্ডারসন যশোরের বারিন্দী ও বার"ই পাড়ায় নীলকুঠি প্রতিষ্ঠা করেন। বার"ই পাড়া থেকে এত বেশি নীল রপ্তানী হতো যে শেষ পর্যন্ত এর নাম পরিবর্তিত হয়ে নতুন নাম হয় নীলগঞ্জ। ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে থেকে পরবর্তীতে কয়েক বছরের মধ্যে যে সব নীলকর ও কারবারী বিলেত থেকে এসে কুঠি স্থাপন করেন তাঁদের মধ্যে তৎকালীন পাবনা জেলার (বর্তমান কুষ্টিয়ার) মীরপুরে টেলর ও ন্যুডসন , আরামবাড়িয়ায় মার্টিন কোম্পানির ম্যানেজার ষ্টিভেনসন, যশোরের ন'হাটায় রিজেন্ট, ঝিকরগাছায় জেংকিন্স ও ম্যাকিঞ্জি, গোস্বামী-দূর্গায় ওয়াটস্, ঝিনাইদহের পার্শ্ববর্তী হাজরাপুরে ডেভরেল সাহেব প্রমুখ অন্যতম।[২৪]

ইতোমধ্যে নীলচাষ ও ব্যবসা অত্যধিক লাভজনক হওয়ায় শুধু ইংরেজ নয়, ফরাসি, দিনেমার, ডাচ, পর্তুগীজ প্রভৃতি জাতির ধনিক সম্প্রদায়, কোম্পানির অনেক কর্মচারী ও সরকারি আমলা চাকরি ও রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে নীলচাষ কিংবা কারবারে আত্মনিয়োগ করে। এছাড়া এদেশের কতিপয় শীর্ষস্থানীয় মুৎসুদ্দি, নব প্রতিষ্ঠিত জমিদারগোষ্ঠী ও মহাজনরা কোথাও ব্যক্তিগতভাবে, কোথাও যৌথ মালিকানায় কারবার খোলে এবং যার ফলে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার নদীয়া, যশোর, খুলনা, চব্বিশ পরগণা, বগুড়া, রাজশাহী, দিনাজপুর, শালদহ, পাবনা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বাকেরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় অসংখ্য নীলকুঠি গড়ে ওঠে।[২৫]

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পাবনা জেলায় নীলচাষ ও নীল উৎপাদন ব্যাপক ভিত্তিতে প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়।[২৬] এ সময়ে বাংলার অন্যান্য জেলার ন্যায় এ জেলায়ও নীলকুঠি গড়ে ওঠে। এ জেলার দেওয়ানগঞ্জ (পাবনার সদর উপজেলার মাঝিপাড়ায়), ধুলাউড়ি (বেড়া উপজেলায়), ধোবরাখোলা (বর্তমানে ভারতের নদীয়া জেলায়), কুমিদপুর (বর্তমানে পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত) ও হিজলাবট (বর্তমানে ভারতের নদীয়া জেলায়) এ পাঁচটি 'কনসার্ন'[২৭] ও নীলকুঠি ছিল প্রধান এবং এগুলির তত্ত্বাবধানে সে সময়ে পাবনার বিভিন্ন স্থানে আরও ৭৫টি নীলকুঠি বা নীল খামার পরিচালিত

হত।[২৮] বর্তমানে এসব নীলকুঠির কোনটি পুরাপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে আবার কোনটির অংশবিশেষ আজও নীলকরদের অত্যাচার ও নির্যাতনের সে স্মৃতি বহণ করে চলেছে।

এছাড়া পাবনা জেলায় নীলকরদের স্মৃতি বিজড়িত যে সকল ঐতিহাসিক ইমারত আজও বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে পাবনা নীলকুঠি অন্যতম। এটি পাবনা শহরের শেষপ্রান্তে পদ্মার পাড়ে সাধুপাড়াতে অবস্থিত। এ কুঠির ইটে নির্মিত তিনটি কোরিন্থীয় রীতির অলংকরণকৃত ক্যাপিটাল যুক্তস্তম্ভ আজও দ"ায়মান রয়েছে। পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে এ কুঠির দ্বিতল ভবন ও দ্বিতলে ওঠার সিঁড়ির ভগ্ন অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। কুঠিটির সম্মুখভাগে ছিল কোরিন্থীয় রীতির একসারি দৃষ্টিনন্দন স্তম্ভ। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এ কুঠিটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ নীলকুঠির বড় সাহেব যে বাড়িতে বাস করতেন, সেটি বর্তমানে জেলা জজের বাসভবন। এ ভবনটি ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত বলে অবগত হওয়া যায়।[২৯]

পাবনা শহরের প্রাণকেন্দ্র কাচারিপাড়ায় অবস্থিত কালেক্টরেটের মূলভবন (যেটি বর্তমানে জেলা ও দায়রা জজের কার্যালয়) বৃটিশ আমলে নীল কুঠিয়ালের কুঠি ছিল বলে জানা যায়। প্রায় ১০ বিঘা জমির কেন্দ্রস্থলে ভবনটি অবস্থিত ছিল। নীল কুঠিয়ালদের কুঠিটি ছিল তাঁদের সান্ধ্যভবন বা ক্লাব। এ ভবনটির ভিত খুব উঁচু এবং নীচে ফাঁকা। ভবনটির কেন্দ্রস্থলে একটি বৃহৎ হল ঘর, যেটি কুঠিয়ালদের সান্ধ্যকালীন নাচঘর হিসেবে ব্যবহৃত হত বলে উলেণ্ডখ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ফলে নীল কুঠিয়ালদের সান্ধ্যভবনের আদি বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে নষ্ট হয়ে গেছে।[৩০]

পাবনা জেলায় অবস্থিত নীল কুঠির মধ্যে ঈশ্বরদী উপজেলার নুর"লণ্ঢাহপুর নীলকুঠি অন্যতম। এটি ঈশ্বরদী উপজেলা শহর থেকে ১২.৮৩ কিলোমিটার দক্ষিণে নুর"লণ্ঢাহপুর গ্রামে পদ্মার ধারে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে বৃটিশ আমলে নির্মিত এ নীলকুঠিটি সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে এবং সে-স্থলে নতুন বসতি গড়ে উঠেছে। বিলুপ্ত নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বেষ্টনী প্রাচীরের জীর্ণ ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। নীলকুঠিটির মালিক ছিলেন নীলকর মি. ককবর্ণ (Mr. Cockborn)। সলপের জমিদার বংশের বিশিষ্ট পুর"ষ বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল নীলকরদের বির"দ্ধে বিদ্রোহের সময় সলপের চতুর্পার্শ্বস্থ ৫/৭টি নীলকুঠি ভূমিস্মাৎ করেন। সে সময়ে এটি ভূমিস্মাৎ হয় বলে ধারণা করা অমূলক নয়।[৩১]

পাবনা জেলার একটি নীলকুঠি ছিল শাহজাদপুর উপজেলায় অবস্থিত রবীন্দ্র কুঠিবাড়ীতে। এটি বর্তমানে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার সদরের অদূরে ফুলঝোর নদীর তীরে অবস্থিত। বৃটিশ আমলে এ দ্বিতল ভবনটি কুঠিয়াল নীলকরদের রংমহল ছিল বলে জানা যায়। এজন্য এটিকে কুঠিবাড়ী বলে অভিহিত করা হয়। এ কুঠিটির নির্মাণ কৌশলের সাথে রাজশাহীর বড় কুঠি ও ছোট কুঠির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।[৩২] উক্ত কুঠিবাড়ী নাটোরের রাণী ভবানীর জমিদারীভূক্ত ৩ নং তৌজিভূক্ত ছিল। বাঁকী খাজনার দায়ে এটি নিলাম হলে কলকাতা জোড়া সাঁকোর ঠাকুর জমিদার প্রিন্স

দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ কুঠিয়ালের কাছ থেকে ক্রয় করে নেয়। তখন থেকে এটি ঠাকুর এস্টেটের কাচারিবাড়ীতে পরিণত হয়।[৩৩]

পাবনা জেলার বারপাখিয়ায় একটি নীলকুঠি ছিল। এ কুঠির কুঠিয়াল সাহেবের নাম ছিল ফেল্টন।[৩৪] পাবনা জেলার (বর্তমান কুষ্টিয়ায় জেলায়) শালঘর-মথুরায় একটি নীলকুঠি ছিল, টমাস আইভাণ কেনি ছিলেন এ কুঠির কুঠিয়াল। কুষ্টিয়া শহরের কেনি রোড এ কুখ্যাত কুঠিয়ালের নামানুসারে আজও বিদ্যমান।[৩৫] এছাড়া পাবনা জেলার (বর্তমানে কুষ্টিয়া) দৌলতপুর, মিরপুর ও ভেড়ামারা এলাকায় বেশ কিছু নীলকুঠি স্থাপিত হয়েছিল।[৩৬]

পাবনা জেলার আরেকটি নীলকুঠি ছিল সুজানগর উপজেলার নাজিরগঞ্জে। এটি বর্তমানে পাবনা শহর থেকে ৪০.৬৪ কিলোমিটার (২৪ মাইল) দক্ষিণ-পূর্বে সুজানগর উপজেলার নাজিরগঞ্জে পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল বলে জানা যায়।[৩৭] এছাড়াও সিরাজগঞ্জ জেলার আমিনপুর গ্রামে কুঠিয়ালরা নীলকুঠি স্থাপনের চেষ্টা করে বলে অবগত হওয়া যায়। সিরাজগঞ্জের ইতিহাস থেকে জানা যায় আমিনপুর ও তদ্‌ঞ্চলের কৃষকদের সংঘবদ্ধ বিদ্রোহের কারণে সেখানে নীলকুঠি স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। সেখানে তাদের খননকৃত পুকুর বর্তমান এবং ধ্বংসস্তুপ আজও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[৩৮]

উপরিউক্ত নীলকুঠিগুলো ছাড়াও এ জেলার ২/৩ টি গ্রাম অন্তর অন্তর বা প্রতিটি গ্রামে যে নীলকুঠি অস্ড়িত্ব ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ; এ জেলার প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই কুঠির মাঠ, কুঠির দিয়াড়, কুঠিপাড়া, কুঠিবাড়ী প্রভৃতি স্থান নামকরণের মধ্য দিয়ে। এছাড়া উপর্যুক্ত কুঠির মাঠ, কুঠির দিয়াড়, কুঠিপাড়া, কুঠিবাড়ী প্রভৃতি স্থানে জমি চাষ কালে আজও ধ্বংসপ্রাপ্ত নীলকুঠির ইট বা ইটের অংশ ও খোয়া বা সুরকি পাওয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে নীল উৎপাদন ও রপ্তানির ব্যবসা ছিল রমরমা। কিন্তু ঊনিশ শতকের চলিণ্ডশ ও পঞ্চাশের দশকে এ বাজার মন্দা হয়ে আসে। এর ফলে রায়ত বা চাষীদের নিকট নীলচাষ অলাভজনক বিবেচিত হয়। এ কারণে চাষীরা নীলচাষে অনাগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু ইতোমধ্যে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রচুর পুঁজি লগ্নি করায় এবং তা দ্রুত প্রত্যাহার করা সম্ভব না হওয়ায় উৎপাদকরা নীলচাষের জন্য রায়তদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।[৩৯] এমনকি কুঠিয়াল সাহেবরা জোরপূর্বক দাদন দিয়ে ভাল ও উর্বর জমিতে এলাকার কৃষকদের নীলচাষে বাধ্য করে। কৃষকগণ স্বেচ্ছায় নীলচাষে আগ্রহী হত না। ফলে নীলকরগণ অসহায় কৃষকদের জমি জবর-দখল, তাঁদের বাড়ী-ঘর লুণ্ঠন ও ধ্বংস, এমনকি তাঁদেরকে খুন-জখমের মত অমানবিক নির্যাতন করে।[৪০] ফলত নীল উৎপাদক ও চাষীদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নীলচাষের বির"দ্ধে রায়তদের প্রকাশ্য প্রতিরোধ আন্দোলনের রূপ নয়। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে যশোর ও নদীয়া জেলায় এ আন্দোলনের সূচনা হয় এবং ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যে নদীয়া, যশোর, বারাসত, পাবনা , রাজশাহী, ফরিদপুর ও নীল উৎপাদনকারী অন্যান্য জেলায় এ বিদ্রোহের আগুন দ্র"ত ছড়িয়ে পড়ে।[৪১]

পাবনা জেলার নীল বিদ্রোহের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন রিপোর্ট, গ্রন্থ ও পত্রে এর ব্যাপকতা ধরা পড়ে। পাবনা জেলার প্রথম নীল বিদ্রোহ দেখা দেয় আমলা সদরপুর জমিদারের অন্তর্ভূক্ত পিয়ারীগ্রামে। জমিদার পিয়ারী সুন্দরী দাসীর নামানুসারে এ গ্রামের নামকরণ করা হয় পিয়ারী গ্রাম। বৃটিশ সরকার এ বিদ্রোহ দমনের জন্য দ্বিতীয় বেঙ্গল ব্যাটেলিয়ানের প্রধান নায়েক হাবিলদার আব্দুস সোবহান (সেভো) খানকে এক বিশাল বাহিনীসহ প্রেরণ করে। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে ১৭ এপ্রিল তাঁর গ্রামের বাড়িতে প্রেরিত একটি পত্র থেকে নীল বিদ্রোহীদের সাথে তাঁর দলের খ"ন্ড যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়। পত্রে তিনি লেখেন-"সকাল বেলায় আমরা প্রস্তুত হয়ে পিয়ারী নামক একটি গ্রামে মার্চ করে গেলাম। সে গ্রামে পৌঁছা মাত্র লাঠি, বলণ্ডম ও তীর-ধনুক সজ্জিত দু'সহস্রাধিক লোক আমাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। তাঁদের বলণ্ডমের আঘাতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অশ্ব আহত হয়। আমরা শুনতে পেলাম যে পাশ্ববর্তী ৫২টি গ্রাম থেকে বিদ্রোহীরা একত্রিত হয়েছে। তাঁদের দিক থেকে কয়েকটি গুলির শব্দও আসছিল।"[৪২] বাকল্যান্ড তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে অনুরূপ ঘটনার উলেণ্ডখ করেছেন এভাবে -"In the District of Pabna a deputy Magistrate with a small body of military police was (partly in consequence of his indudicious conduct) repulsed by a body of lathials, who had assembled to rasist cultivation of indigo."[৪৩] এ ঘটনার সংবাদ পেয়ে কেনি পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। পরবর্তীতে তার আবেদনে সরকার পাবনার ম্যাজিস্ট্রেট হ্যামডেনের নেতৃত্বে দারোগা মাহমুদ বখ্‌শের অধীনে একটি পুলিশ বাহিনী প্রেরণ করে। এ বাহিনী প্রায় ১৫ দিন আগ থেকে কুঠি রক্ষায় নিযুক্ত ছিল। গড়খাই ও দ্বিতল অট্টলিকা থেকে অবিরাম গুলিবর্ষণ সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা কুঠির ওপর সফল আক্রমণ পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। ম্যাজিস্ট্রেট হ্যামডেন আহত হয়ে প্রাণরক্ষা করলেও দারোগা মাহ্‌মুদ সুড়কির আঘাতে নিহত হয়। কুঠিয়ালের বাসভবনসহ প্রায় সমগ্র কুঠিবাড়ি বিদ্রোহীদের অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত ও বিধ্বস্ত হয়।[৪৪]

পাবনা জেলার বারপাখিয়ার কুঠিয়াল ফেল্টন একদিন দু'জন নির্দোষ কৃষকের ওপর চাবুক মারলে বারপাখিয়ার কুঠিতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তারা ফেল্টনকে শাস্তি দানের জন্য এহ্‌সান খাঁ, গুলজার খাঁ ও জাহান্দার খাঁ-এর নেতৃত্বে ফেল্টনের ঘোড় সওয়ার পথে পরিখা খনন করে তার ওপরে হালকা বাঁশ দিয়ে আস্তরণ করে রাখে। ফেল্টন দ্র"ত ঘোড়া চালিয়ে যাবার সময় ঘোড়াসহ পরিখায় পতিত হলে তার পা ভেঙ্গে যায়। তিনি ব্যথায় চিৎকার করতে থাকলে বিদ্রোহীরা তাকে বন্দি করে গ্রামে নিয়ে যায়। তিনি বিদ্রোহী নেতাসহ সকলের নিকট ক্ষমা চান এবং চিরদিনের জন্য বারপাখিয়া ত্যাগ করেন। এরপর সেখানে আর নীলচাষ হয়নি।[৪৫]

পাবনা জেলার (বর্তমানে কুষ্টিয়া) দৌলতপুর, মিরপুর ও ভেড়ামারা এলাকায় নীলকুঠিতেও নীল বিদ্রোহ দেখা দেয়। দৌলতপুর, মিরপুর ও ভেড়ামারা এলাকার নীল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন তারাগুনিয়ার ইউসুফ উদ্দিন, গাহিরদিয়ার কিয়ামত মোলণ্ডা, দিলিপনগরের আওলাদ আলী, গরিব হোসেন, নেয়ামত উলণ্ডাহ সরকার ও সোমেশ

মৌলবি (তাঁর প্রকৃত নাম সোমেশ্বর প্রসাদ চৌধুরী)। সরকার বহুবার সোমেশ মৌলবিকে জেলে আটকে রেখে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়।[৪৬]

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে যে নীল বিদ্রোহ হয় তার প্রধান স্থান ছিল পাবনা জেলাঞ্চল (বর্তমান কুষ্টিয়া)। এমনকি নীল বিদ্রোহের সময় যে ঘটনাটি বৃটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় সে ঘটনাটিও ঘটেছিল পাবনা অঞ্চলেই। তদানীন্তন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার জে.পি. গ্রান্ট কলকাতা থেকে সোনামুখী জাহাজে কুষ্টিয়ার ওপর দিয়ে প্রবাহিত কুমার ও মাথাভাঙ্গা নদী পথে পাবনা গমনের সময় নদীর দু'ধারে লক্ষ লক্ষ নীলচাষী সমবেত হয়।[৪৭] ঘটনাটির বর্ণনা পাওয়া যায় তাঁর নিজস্ব ডায়রিতে, তিনি আন ডায়রিতে উলেণ্ঢখ করেছেন এভাবে -"Numerous crowds of Raiyats at various places whose whole prayer was for an order of Government that they should not cultivate indigo. On my return a few days afterwards along the same rivers from dawn to dusk as I steamed along these two rivers for some 60 to 70 miles both banks were literally lined up crowds of villagers claiming justice."[৪৮] গভর্ণরের জাহাজ এত লোক দেখে থামতে না চাইলে নদীর দু'ধারের লোক নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ায় গভর্ণর জাহাজ থামান এবং প্রজাদের পাবনায় আসতে বলেন। এদিকে লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার জে. পি. গ্রান্ট এর পাবনা সফরকালে হাজার হাজার কৃষক নীলকরদের বির"দ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পাবনার এহেন পরিস্থিতিতে লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার জে. পি. গ্রান্ট ঘোষণা করেন "অন্যান্য ফসলের মত নীলচাষ করা-না করা কৃষকের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। কেউ জোর করে নীলচাষ করালে সরকার তাঁর বির"দ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। এবং অচিরেই নীলচাষ বন্ধের ব্যবস্থা নেয়া হবে।"[৪৯] তাঁর এ ঘোষণার মাধ্যমে পাবনা জেলার নীল বিদ্রোহের ব্যাপকতা প্রমাণিত হয়।

অতঃপর ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে সরকার এ সম্পর্কে একটি কমিশন গঠন করে। এ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর বলপূর্বক নীলচাষে বাধ্য করার কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে একটি আইন পাস হয়। এ আইনের ফলে নীলচাষের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পাবনা জেলার নীল বিদ্রোহেরও অবসান হয়।[৫০] পাবনা জেলার কৃষকদের নীল বিদ্রোহের এ সফলতা পরবর্তীতে বৃহত্তর সংগ্রামের পথে অনুপ্রাণিত করে ; যার জ্বলন্ত উদাহরণ ১৮৭০-৭২ খ্রীস্টাব্দে পাবনা জেলার কৃষক বিদ্রোহ।

কৃষক বিদ্রোহ

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের পাবনা জেলার কৃষক বিদ্রোহ বা প্রজা বিদ্রোহ ইতিহাসের পাতায় একটি অবিস্মরনীয় ঘটনা। এ বিদ্রোহ শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসে নয়, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ প্রজা বিদ্রোহকে 'পাবনা বিদ্রোহ' নামেও অভিহিত করা হয়। আবার "পলো বিদ্রোহ"[৫১] নামেও এর পরিচিতি রয়েছে। W.W. Hunter রচিত "A Statistical Account of Bengal" গ্রন্থে এ অঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এছাড়া এতদ্‌বিষয়ক সরকারি

চিঠিপত্রে এবং রিপোর্টে এর ব্যাপকতা জানা যায়। এছাড়া গ্রাম্য গানে ও ছড়ায় এ বিদ্রোহের প্রমাণ পাওয়া যায়-

"লাঠি হাতে পলো কাঁধে চলল সারি সারি
সকলের আগে যায়ে, লুটলো বিশির কাছারি।"[৫২]

১২৮১ বঙ্গাব্দের ২৮ বৈশাখ পাবনা জেলার চাটমোহর উপলোর জ্ঞান বিকাশিনী প্রেসে মুদ্রিত উমাচরণ চৌধুরী লিখিত "গীত কৌমুদী" নামক কবিতাবলীর নিম্নলিখিত কবিতাংশে এ বিদ্রোহের প্রমাণ পাওয়া যায়-

"কি বিদ্রোহী পরিত্রাহী বাপরে বাপ্ মলেম্ মলেম্
কি তামাসা সকল চাষা ভেবেছিল রাজা হলেম্ ॥
হাতে পলো, কাঁধে লাঠি লোটে যত ঘটি বাটি।
মাংনা খাব রাজার মাটি ভয়ে ভীর" অবাক হলেম ॥
দেশের যত বামন ভদ্র তারা কি আর আছে ভদ্র।
বিদ্রোহীর দল দেখা মাত্র নজর আর বাজায় সেলাম ॥"[৫৩]

পাবনা জেলার (বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার) শাহজাদপুর উপজেলার ইউসুফশাহী পরগণায় প্রথম কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয় বলে জানা যায়। এ পরগণাটি এক সময় নাটোরের জমিদার রাণী ভবানীর অধীনস্থ ছিল। পরবর্তীতে নাটোর জমিদার পরিবার অর্থকষ্টে পতিত হলে ইউসুফশাহী পরগণা বাঁকী খাজনার দায়ে নিলামে ওঠে এবং কলকাতার জোড়াসাঁকোর জমিদার ঠাকুর পরিবার, ঢাকার মুড়াপাড়ার জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় বা ব্যাণার্জী পরিবার, সিরাজগঞ্জের সলপের জমিদার স্যানাল পরিবার, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার অন্তর্গত পোরজনার ভাদুড়ী জমিদার পরিবার এবং সিরাজগঞ্জের চৌহালীর উপজেলার অন্তর্গত স্থলের পাকড়াশী জমিদার পরিবার এ জমিদারী কিনে নেয়। প্রথম থেকেই এ সমস্ত নবাগত জমিদারদের একে অন্যের সাথে এবং প্রজাদের সাথেও সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। এমনকি প্রজাদের উন্নতি সাধনে তারা বিন্দুমাত্র অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি।[৫৪] এ সমস্ত জমিদাররা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ইচ্ছামত কৃষকদের ওপর উচ্চহারে কর, উপকর ও অবৈধ কর ধার্য করে এবং জোরপূর্বক তা আদায় করে। খাজনা প্রদানে বিলম্ব বা অপারগতায় জমিদারগণ কৃষকদের ওপর জুলুম-মারপিট, হাজতে আবদ্ধ করা, হয়রানি, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত প্রভৃতি অমানবিক অত্যাচার করে।[৫৫] এছাড়া পূর্ব থেকেই এ অঞ্চলে জমি মাপার জন্য ২৩.৫ ইঞ্চিকে এক হাত ধরা হত। কিন্তু নব্য জমিদারগণ উক্ত মাপ পরিবর্তন করে ১৮.৫ ইঞ্চিকে এক হাত ধার্য করে। এতে বিঘা হিসেবে জমির পরিমাণ বেড়ে যায় এবং খাজনার পরিমাণও বেড়ে যায়। এভাবে কালক্রমে ইউসুফশাহী পরগণাতে খাজনার পরিমাণ অন্যান্য পরগণার তুলনায় কয়েকগুন বৃদ্ধি পায়।[৫৬] উপরিউক্ত কারণসমূহের পরিপেক্ষিতে প্রথমে ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে ১ জুলাই ২৬৯ গ্রামের বহুলোক একত্রিত হয়ে সিরাজগঞ্জ জেলা ম্যজিস্ট্রেট মি. নোলানের নিকট জমিদারদের অত্যাচারের অবসানের অনুরোধ জানায়।[৫৭]

১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে জমিদার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর এক দফা এ পরগণার খাজনা বৃদ্ধি করলে প্রজাসাধারণের মনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এমনকি একদল প্রজা নিজেদের জমি বিক্রি বা পরিত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী জমিদারদের এলাকায় চলে যায় বলে জানা যায়। এভাবে ঠাকুর জমিদার পরিবারের অত্যাচারে প্রজাগণের অনেকে বাস্তহারা হয়ে পড়ে।[৫৮] এ সময়ে কিছু কিছু গ্রামের প্রজা জমিদারদের অতিরিক্ত খাজনা আদায়ে বাঁধা দেয় এবং তারা জমিদারদের অত্যাচার প্রতিহত করার জন্য আদালতে মূল খাজনা জমা দেয়। জমিদাররা তাঁদের বির"দ্ধে নিম্ন আদালতে মামলা করে ডিগ্রি পায়। প্রজারাও ঐক্যবদ্ধভাবে আপিল করল রাজশাহীর জজ আদালতে। আপিলে জজ সাহেব জমিদারের দাবী নাকচ করে প্রজার পক্ষে রায় ঘোষণা করেন। এ রায়ের ফলে প্রজাদের মনোবল অনেক গুণে বেড়ে যায়। জমিদার পক্ষ মামলায় হেরে গিয়ে কোর্ট থেকে ফেরার পথে একজন প্রজাকে অপহরণ করে। দশদিন পর্যন্ত তার কোন হদিস না মেলায় ম্যাজিস্ট্রেট পিটার নোলান উদ্যোগী হয়ে উক্ত অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে এবং জমিদার প্রতিনিধিদের নিকট থেকে ঐ ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে না ঘটানোর জন্য মুচলেকা আদায় করে।[৫৯] এ ঘটনা কৃষক বিদ্রোহকে ত্বরান্বিত করে। এ বিদ্রোহ ঐ বছরের জুন মাসের মধ্যে সমগ্র পরগণায় ছড়িয়ে পড়ে। এরপর শাহজাদপুর উপজেলার অধীনস্থ গ্রামসমূহে এ বিদ্রোহের সূচনা হয় এবং পার্শ্ববর্তী উলণ্ঢাপাড়া ও সিরাজগঞ্জ থানায় এ বিদ্রোহের ব্যাপকতা ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর সিরাজগঞ্জ মহকুমা হতে পাবনা সদর মহকুমার ফরিদপুর, বেড়া, সুজানগর ও সদর থানায় এ বিদ্রোহ প্রভাব বিস্তার করে। পরবর্তীতে পাবনা জেলার অত্যন্ত পশ্চাদপদ এলাকায়ও এ বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। পাবনা হতে পার্শ্ববর্তী বগুড়া জেলায়ও তা প্রসারিত হয় বলে জানা যায়।[৬০]

পাবনা জেলার কৃষক বিদ্রোহে ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির ভূমিকাই ছিল সমধিক। তবে এ বিদ্রোহকে সঠিক ও সুসংগঠিতভাবে এবং পরিকল্পনামাফিক পরিচালনার জন্য যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন 'ঈশানচন্দ্র রায়' [৬১]। তিনি প্রজাদের নিকট ঈশান রাজা বা বিদ্রোহী রাজা নামে পরিচিত ছিলেন। রুদ্রগাঁতির বিখ্যাত অশ্বারোহী গঙ্গাচরণ পাল নামক জনৈক কায়স্থ তাঁর সহকারী ছিলেন। গঙ্গাচরণ পালের পিতা কালীচরণ পাল পাবনায় মোক্তারি করতেন বলে জানা যায়। গঙ্গাচরণ পাল বিদ্রোহী রাজার দেওয়ান নামে পরিচিত ছিলেন।[৬২]

ঈশানচন্দ্র রায় গঙ্গাচরণ ও ক্ষুদি মোলণ্ঢার সহযোগিতায় এ বিদ্রোহ পরিচালনা করতেন। এ কাজে তাঁকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য ১১ সদস্য বিশিষ্ট পরিষদ ছিল বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়। ঐতিহাসিক রাধারমন সাহা তাঁর পাবনা জেলার ইতিহাস গ্রন্থে ১১ সদস্য বিশিষ্ট প্রজা বিদ্রোহী পরিষদের নাম উলেণ্ঢখ করেছেন তাঁরা হলেন :

(১) **ঈশানচন্দ্র রায়**- বিদ্রোহীদের রাজা।

(২) **ক্ষুদি মোলণ্ঢা-** তিনি পেশায় ছিলেন রাজমন্ত্রী। তিনি ছিলেন বিদ্রোহীদের দ্বিতীয় প্রধান নেতা। তাঁর বাড়ি ছিল শাহজাদপুর থানার যবতলায়।

(৩) **গঙ্গাচরণ পাল** - তিনি ছিলেন শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত হুরাসাগর নদীর পশ্চিম তীরের শাসনকর্তা। তিনি ঈশানচন্দ্র রায়ের দেওয়ান ছিলেন।

(৪) **শম্ভুনাথ পাল** – তিনি ছিলেন প্রজা বিদ্রোহী পরিষদের সুপারিনটেনডেন্ট। তিনি ছিলেন শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত মেঘুলণ্ঢা গ্রামের অধিবাসী।

(৫) **রমজান সরকার**- তিনি ছিলেন বিদ্রোহী পরিষদের নায়েব। তাঁর বাড়ি ছিল শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত ডুলিয়াবাড়ি গ্রামে।

(৬) **জাকের জোয়াদ্দার**- তিনি ছিলেন বিদ্রোহী পরিষদের অন্যতম নেতা। তাঁর পদবী ছিল গোমস্তা। তিনি ছিলেন শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত আড়কান্দি গ্রামের অধিবাসী।

(৭) **রহিম প্রামাণিক** - তিনি ছিলেন প্রজা বিদ্রোহী পরিষদের প্রধান বা সর্দার। তাঁর বাড়ি ছিল শাহজাদপুর থানার হোড়দিঘলিয়া গ্রামে।

(৮) **হাজারি প্রামাণিক**- হাজারি প্রামাণিক শাহজাদপুর থানার জালালপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত রূপসী গ্রামের অধিবাসী, তিনি ছিলেন প্রজা বিদ্রোহী পরিষদের সদস্য ও অন্যতম নেতা। তাঁর পদবী ছিল পাইক।

(৯) **আরবিন্দ মৃধা**- আরবিন্দ মৃধাও ছিলেন প্রজা বিদ্রোহী পরিষদের সদস্য ও অন্যতম নেতা। তাঁর বাড়ি ছিল শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত মহারাজপুর গ্রামে।

(১০) **নন্দীর সরকার**- নন্দীর সরকার ছিলেন প্রজা বিদ্রোহী পরিষদের সদস্য ও অন্যতম নেতা। তিনি পেশাগতভাবে ছিলেন জরিপ আমিন। তিনি ছিলেন শাহজাদপুর থানার হাতকোড়া গ্রামের অধিবাসী।

(১১) **জগৎ ভৌমিক**- জগৎ ভৌমিক ছিলেন প্রজা বিদ্রোহী পরিষদের সদস্য ও অন্যতম নেতা। তিনি পেশাগতভাবে ছিলেন জজ আমিন। তিনি ছিলেন শাহজাদপুর থানার হাতকোড়া গ্রামের অধিবাসী।[৬৩]

বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে ব্যাপক কৃষক সাধারণের সংগ্রামী ঐক্য ছাড়া আন্দোলনে কখনও সফলতা লাভ করা সম্ভব না। তাই তারা এ আন্দোলনে জনসাধারণের ব্যাপক অংশগ্রহণের জন্য অভিনব কৌশল গ্রহণ করে, যেমন- তারা শিঙ্গাধ্বনি ব্যবহার করে বিদ্রোহীদের একত্রিত করত। এমনকি কৃষক আন্দোলন যেন উত্তেজনায় ফেটে পড়ে সেজন্য বিভিন্ন স্থানে প্রচারক দল প্রেরণ করে নতুন নতুন গ্রাম এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এছাড়া সভা-সমিতির মাধ্যমে এ আন্দোলনকে আরও বহুগুণে বেগবান করা হয়। এই ধারাবাহিকতায় বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ সলপের সান্যাল জমিদার পরিবারের আবাসস্থলের নিকটবর্তী স্থানে কৃষক মহাসমাবেশের আয়োজন করে । এ সমাবেশে বিভিন্ন প্রজাসাধারণ অংশগ্রহণ করে। বিদ্রোহী নেতারা এ সমাবেশে অংশগ্রহণের জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানায় এবং অংশগ্রহণ না করলে প্রতিশোধ নেবারও ঘোষণা দিয়েছিল বলে জানা যায়।[৬৪] এভাবে কৃষক আন্দোলন জনগণের ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। কিন্তু বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ সরকারের নিকট থেকে তেমন কোন

সাড়া না পেয়ে বিদ্রোহকে সশস্ত্র সংগ্রামে রূপ দেয়। এ পর্যায়ে তারা জমিদারদের বাড়ী- ঘর আক্রমণ করে। বিদ্রোহীদের আক্রমণে জমিদারেরা যখন বাড়ী-ঘর ফেলে চতুর্দিক থেকে শহরে আশ্রয় নিতে থাকল তখন সরকারের টনক নড়ল।[৬৫] এভাবে প্রজা বিদ্রোহ জটিল আকার ধারণ করলে তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. পিটার নোলানের মধ্যস্থতায় বিদ্রোহী প্রজাদের সঙ্গে ২২-০৯-১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে জমিদারদের একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সরকারের পক্ষ থেকে উভয় পক্ষকে বিশেষভাবে সতর্ক করে দেয়া হয় যে কারও বেআইনী কোন কাজ ক্ষমা করা হবে না এবং কারও ন্যায় অধিকার হতে বঞ্চিত করা হবে না।[৬৬] এমতাবস্থায় সরকার পরিস্থিতি যাচাইয়ের জন্য একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে। এ কমিশন ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে "Law Relating to Land Lords and Tenants- Act VII of 1859 A.D." আইন পর্যালোচনা করে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে একটি রিপোর্ট পেশ করে। এ রিপোর্টে আইন প্রণয়নের জন্য একটি খসড়া বিলও সংযুক্ত করা হয়েছিল। এ আইনটি "*Bengal Land Tanancy Act-1885* A.D. বা বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন" রূপে পরিগণিত হলো। এ আইনের ফলেই জমিতে প্রজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো।[৬৭] ফলে পাবনা জেলাসহ বাংলার বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত প্রজা বিদ্রোহ স্তিমিত হতে লাগল।

এছাড়া সরকার বিদ্রোহ দমনের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট টেলর সাহেবের নেতৃত্বে অনেক স্পেশাল পুলিশ পাবনায় পাঠানো হয়, তারা বিদ্রোহের কেন্দ্রগুলোতে টহল দিতে থাকে। বহুস্থানে স্পেশাল পুলিশ কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়, তারা দলবলসহ বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে। এ সময়ে বিভাগীয় কমিশনার সাহেব রাজশাহী থেকে চল্লিশজন অতিরিক্ত পুলিশ পাঠায়। ছোটলাট সাহেবের আদেশে গোয়ালন্দ থেকে সামরিক পুলিশ পাবনায় আনয়ন করা হয়।[৬৮]

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট টেলর সাহেবের বিশেষ প্রচেষ্টায় ঈশানচন্দ্র রায়সহ ৩০২ জন কৃষক নেতাকে গ্রেফতার করে পাবনায় আনা হয়। বিচারে ঈশানচন্দ্র রায় মুক্তি লাভ করে। গ্রেফতারকৃত অন্যান্যদের এক মাস থেকে দু' বছর পর্যন্ত শাস্তি দেয়া হয়।[৬৯]

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বৃটিশ যুগে সংঘটিত ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ ও প্রজাবিদ্রোহে পাবনা জেলার অবদান ছিল অপরিসীম। আবহমান কাল থেকে বাংলার কৃষক অবহেলিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত। বাংলায় নীলচাষ শুরু হলে পাবনা জেলায় এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে নীলচাষের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হলে পাবনা জেলায় এর ব্যাপকতা অধিকহারে বৃদ্ধি পায়। ফলে বাংলার তৎকালীন লেফটেনেন্ট গভর্ণর স্যার জে.পি .গ্রান্ট পাবনায় এসে নীলচাষ বন্ধ ঘোষণা করে। এছাড়া ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে পাবনা জেলার কৃষকরা আন্দোলন ও সংগ্রামের একটি মাইলফলক স্থাপন করে। এটি ছিল উপমহাদেশের ইতিহাসে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও ভূমি সংস্কারের প্রথম গণতান্ত্রিক আন্দোলন। এ আন্দোলনেই প্রথম ধর্মঘট ও হরতালের কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল। ধর্মঘটী কৃষকরা জমিদারের খাজনা বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে সরকার বাধ্য হয়ে প্রজাদের অধিকার সম্বলিত "*Bengal Land Tanancy Act-1885 A.D.* বা বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব" আইন পাশ করে। কাজেই উপমহাদেশের ইতিহাসে পাবনা জেলার কৃষক বিদ্রোহের তাৎপর্য অপরিসীম।

তথ্য নির্দেশিকা

১ ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। তৎকালীন ইংরেজ শাসকদের লিখিত পত্রাবলী ও রিপোর্টে এ বিদ্রোহকে 'সন্ন্যাসীদের আক্রমণ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এ বিদ্রোহকে প্রথম 'কৃষক বিদ্রোহ' নামে অভিহিত করে একে হিন্দুস্থানের যাযাবরদের পেশাদারী উপদ্রব দস্যুতা ও ডাকাতি বলে ব্যাখ্যা করেছেন। যামিনী মোহন ঘোষ তাঁর "*Sannayasi and Fakir Raiders in Bengal*" গ্রন্থে এ বিদ্রোহকে বিহার ও বাংলার বাইরে থেকে আগত যাযাবর প্রকৃতির নাগা সন্ন্যাসী ও ভোজপুরী দস্যু ডাকাতদের আক্রমণ ও উৎপাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। W.W.Hunter এ সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে কৃষক বিদ্রোহ বলে সনাক্ত করে বিদ্রোহীদের মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত সৈন্যবাহিনীর বেকার ও বুভূক্ষ সৈন্য এবং জমিহারা গৃহহারা বুভূক্ষ কৃষক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এরা সন্ন্যাসীরূপে দলবদ্ধ হয়ে সমগ্র বঙ্গদেশে ঘুরে বেড়াত, এদের সংখ্যা এক সময় ৫০ হাজারে উন্নীত হয়েছিল বলে জানা যায়। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে যে বিপুল সংখ্যক সৈন্য তাঁদের জীবিকা হারিয়েছিল, তাঁদের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ লক্ষ। জমি থেকে উচ্ছন্ন সর্বস্বান্ত কৃষক ও জমিদারগণ তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল। দ্র নুরুল ইসলাম খান, *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার পাবনা* (ঢাকা : বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯০), পৃ. ৪০ ; Rai Sahib Jamini Mohan Ghosh, *Sannayasi and Fakir Raiders in Bengal,* Calcutta, 1930, P. 127 ; Hestings Letter to Joslas Depre, Dated 9th March,1973, is found in Creigh's Memoirs ; মুহাম্মদ আবূ তালিব, *ফকীর নেতা মজনু শাহ্* , ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ২০০৪, পৃ. ১৩ ; W.W.Hunter, *The Annals of Rural Bengal,* London, 3rd Edition, 1868, P. ৭০-৭২ ; সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম* (কলকাতা : ১৯৭২), পৃ. ১৭।

২ শাহ সুলতান হাসান মুরিয়া বুরহানা (রহ.) ছিলেন বিখ্যাত মুঘল সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার শাহ সুজার পীর। তিনি উপমহাদেশের বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক সূফীসাধক হযরত বদীউদ্দীন শাহ-ই-মাদারের সিলসিলাভূক্ত ফকিরও ছিলেন। তৎকালীন সময়ে উপমহাদেশে ইসলামি সম্প্রদায়ভূক্ত ফকির-দরবেশদের মধ্যে যাঁরা খানদানী ফকির নামে পরিচিত শাহ-ই-মাদার সম্প্রদায় তাঁদেরই অন্তর্ভূক্ত। এ সম্প্রদায় সাধারণত 'তবাকাদী' ও 'মাদারী' নামে পরিচিত ছিল। হযরত হাসান মুরিয়া বুরহানার নামেও একটি সিলসিলা জারি হয়েছিল, এ সিলসিলা 'বুরহানা' খানদান নামে পরিচিত । 'বুরহানা' শব্দের অর্থ 'নগ্ন'। ধারণা করা হয় এ খানদানের ফকিরদের বেশভূষা ও চালচলনের অদ্ভুত্বের এরূপ নামকরণ হয়েছিল। মুসলিম বাদশাহদের দরবারে এদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অপরিসীম। সুলতান হাসান মুরিয়া বুরহানাকে শাহ সুজা এতই ভক্তি করতেন যে, তাঁর সম্মানার্থে তিনি যে সনদ দিয়েছিলেন তাতে তাঁকে প্রায় স্বাধীন নৃপতির মর্যাদা দেয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। দ্র. *ফকীর নেতা মজনু শাহ্* , পৃ.৫০।

[৩] সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া* , ৬ষ্ঠ খণ্ড, (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩), পৃ.৯২।

[৪] প্রাগুক্ত।

[৫] মজনু শাহ্ মাদারিয়া তরিকার সুফি সাধক এবং বাংলায় ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নায়ক। তিনি ছিলেন ভারতের মেওয়াটের অধিবাসী। তাঁর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। এমনকি তাঁর প্রকৃত নাম আজও অজানা রয়েছে। তবে তিনি মজনু শাহ্ নামেই বেশী পরিচিত। কখনও মজনু শাহ্ বুরহানা, আবার কখনও বা মজনু ফকির নামে তাঁর উলেণ্টখ পাওয়া যায়, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে অথবা আঠারো শতাব্দীর প্রথমভাগে সুদূর পাঞ্জাব প্রদেশের আলোয়ার রাজ্যের অন্তর্গত মেওয়াটে মতান্তরে কানপুরে তাঁর জন্ম হয় এবং মৃত্যু হয় বাংলাদেশের উত্তর এলাকার রংপুরে বা দিনাজপুর জেলার মাখনপুরে ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে মার্চ অথবা মে মাসে। তাঁকে দাফন করা হয় তাঁর জন্মভূমি মেওয়াট জেলার অন্তর্গত ধুলী নদীর তীরে। আজও উপমহাদেশের বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমান তাঁর মাযার জিয়ারত করতে যায়। দ্র. *ফকীর নেতা মজনু শাহ্* , পৃ. ৪৮ ; *বাংলাপিডিয়া*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৪।

[৬] *বাংলাপিডিয়া*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৩।

[৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩।

[৮] *প্রাগুক্ত।*

[৯] *প্রাগুক্ত।*

[১০] এম.এ. হামিদ টি.কে, *চলনবিলের ইতিকথা*, (পাবনা : আমাদের দেশ প্রকাশনী, ১৯৬৭), পৃ. ২২৬।

[১১] এ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান, *সিরাজগঞ্জের ইতিহাস*, (সিরাজগঞ্জ : বাংলাদেশ কবিতা ক্লাব, সিরাজগঞ্জ, ২০০৫), পৃ. ৪৫-৪৯।

[১২] *চলনবিলের ইতিকথা*, পৃ.২২৬।

[১৩] রাধারমন সাহা, *পাবনা জেলার ইতিহাস* (১-৬ খণ্ড একত্রে), কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, অখণ্ড সংস্করণ ২০০৪), পৃ. ১৫৬-১৫৭।

[১৪] ড. আয়শা বেগম, ***পাবনার ঐতিহাসিক ইমারত,*** (ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০২), পৃ.২১৯।

[১৫] এ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান, *সিরাজগঞ্জের ইতিহাস*, পৃ. ৪৬।

[১৬] *বাংলাপিডিয়া*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৪।

[১৭] মুহম্মদ ইউসুফ হোসেন, *নীল বিদ্রোহের নানাকথা* (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯০), পৃ. ১৭ ; রাজিব আহমেদ, *বাংলায় নীল চাষ ও নীলবিদ্রোহের ইতিহাস (*ঢাকা : গতিধারা, ২০০৮), পৃ. ১১।

[১৮] নীল এক রকম গাছ। ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান নাম ইন্ডিগো (Indigo), ল্যাটিন নাম ইন্ডিগো-ফেরা (Indigo-Ferra)। বাংলা ও হিন্দিতে নীল, সংস্কৃতিতে নীলিকা, তুর্কীতে ওসমা, আরবিতে নীলাজ এবং পারসিতে নীলহ্। এর বৈজ্ঞানিক নাম Indigofera Tinctoria। নীল শব্দের অর্থ কৃষ্ণ ; অনেকের মতে কালো অর্থে ব্যবহৃত। পৃথিবীতে প্রায় ২৫০/৩০০ প্রকার নীল গাছ আছে, তন্মধ্যে ভারত উপমহাদেশে প্রায় ৪০ রকম নীল গাছ দেখা যায়। নীল গাছ

এক, দুই বা বহুবর্ষজীবি। পাতা সাধারণত যৌগিক, তবে কোন কোন প্রজাতির পাতা সরল বলে জানা যায়। দ্র. *বাংলায় নীল চাষ ও নীলবিদ্রোহের ইতিহাস*, পৃ.১১-১২ ; *নীল বিদ্রোহের নানাকথা*, পৃ. ১৭-২০।

[১৯] সম্পাদনা পরিষদ, *শতবর্ষ স্মরণিকা* (পাবনা : পাবনা পৌরসভা, ১৯৭৬), পৃ. ২৮।

[২০] কোন কোন গ্রন্থে তার নাম লুই বন্নো, আবার কোন কোন গ্রন্থে লুই বনার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। লুই বড ভাগ্যান্বেষণে যৌবনের প্রারম্ভে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গমন করেন। সেখান থেকে আমেরিকা গিয়ে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে চন্দননগরে এসে বসতি স্থাপন করেন। ঐ একই বছরে পার্শ্ববর্তী গোন্দালপাড়া ও তালডাঙ্গায় দুটি নীলকুঠি স্থাপন করেন। তার নীল ব্যবসা আরো প্রসার লাভ করলে কয়েক বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে মালদহ, বাকিপুর, যশোরের ন'হাটা ও কালনাতে কুঠি ও কারখানা স্থাপন করেন। ১৮২০/২১ খ্রীস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। দ্র. মহসিন হোসাইন, *নীলবিদ্রোহের অজানা ইতিহাস* (ঢাকা : বইপত্র প্রকাশনী, ২০০৮), পৃ. ১১ ; *নীল বিদ্রোহের নানাকথা* , পৃ. ১৭-২০ ।

[২১] প্রাগুক্ত, পৃ.২৫ ; *নীলবিদ্রোহের অজানা ইতিহাস*, পৃ. ১১।

[২২] শ ম শওকত আলী, *কুষ্টিয়ায় ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ , ১৯৯২), পৃ. ১৮৪ ; *নীল বিদ্রোহের নানাকথা*, পৃ. ১৮।

[২৩] প্রাগুক্ত।

[২৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

[২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯ ; *নীলবিদ্রোহের অজানা ইতিহাস*, পৃ. ১১।

[২৬] সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ,* চতুর্দশ খণ্ড (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ৪২১ ; *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার পাবনা*, পৃ. ৪৩ ।

[২৭] কনসার্ন হলো সদর কুঠি। কনসার্ন-এর পরিচালনা বোর্ড প্রত্যেক কুঠিতে একজন ম্যানেজার বা অধ্যক্ষ নিয়োগ করত। তাকে বড় সাহেব ও তার সহকারীদেরকে ছোট সাহেব বলা হত। কনসার্ন বা সদর কুঠির অধীনস্থ কুঠিগুলিকে রেকর্ডপত্রে ফ্যাক্টরি বা কুঠি নামে উলেণ্টখ করা হয়েছে ; পাবনা জেলায় এ রকম ১৬ টি কনসার্ন ছিল বলে সিরাজগঞ্জের ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায়। কনসার্নগুলি হলো ঃ-(১) মাঝিপাড়া (২) ধুলাউড়ি (৩) শিলাইদহ (৪) ধোবড়াকোলা (৫) হিজলাট (৬) শালঘর মথুরা (৭) দামুদিয়া (৮) ভেলনাবাড়িয়া (৯) মোহনগঞ্জ (১০) ঘোড়াদহ (১১) কুমিদপুর (১২) জামিরতা (১৩) বেলেকান্দি (১৪) মীরপুর (১৫) পারসৎিসী (১৬) রামুনদী। দ্র. *নীল বিদ্রোহের নানাকথা*, পৃ. ২১ ; এ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান, সিরাজগঞ্জের ইতিহাস, পৃ. ৮৩ ।

[২৮] *পাবনা জেলার ইতিহাস*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩ ; *শতবর্ষ স্মরণিকা*, পৃ. ২৮ ; *দৈনিক সংগ্রাম*, ১২ সেপ্টেম্বর-২০০৪।

[২৯] *পাবনার ঐতিহাসিক ইমারত*, পৃ. ১২৬-১২৭।

[৩০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮ ; দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ জুলাই-২০০৫, পৃ. ১২।

[৩১] *পাবনার ঐতিহাসিক ইমারত*, পৃ.১২৭ ।

[৩২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩ ।

[৩৩] এ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান, *সিরাজগঞ্জের ইতিহাস*, পৃ.৮৫ ; *পাবনার ঐতিহাসিক ইমারত*, পৃ. ২২৩।
[৩৪] *নীলবিদ্রোহের অজানা ইতিহাস*, পৃ. ৪৬।
[৩৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩।
[৩৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৬।
[৩৭] *পাবনার ঐতিহাসিক ইমারত*, পৃ. ১২৭।
[৩৮] এ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান, *সিরাজগঞ্জের ইতিহাস*, পৃ. ৮৪।
[৩৯] *বাংলাপিডিয়া*, ৫ম খ, পৃ. ১৪৫।
[৪০] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, চতুর্দশ খ, পৃ. ৪২১।
[৪১] *নীল বিদ্রোহের নানাকথা* , পৃ. ৫৯।
[৪২] *প্রাগুক্ত* ; *শতবর্ষ স্মরণিকা*, পৃ. ২৯।
[৪৩] C.E. Buckland, *Bengal Under the Lieutenant Governors,* vol-1, (Calcutta: 1901), p. 188 ; *পাবনা জেলার ইতিহাস* , পৃ. ১৬৩-১৬৪ ; *নীল বিদ্রোহের নানাকথা* , পৃ. ৫৯।
[৪৪] *Hindu Patriot,* June-1860 ; *নীল বিদ্রোহের নানাকথা* , পৃ. ৫৯।
[৪৫] *নীলবিদ্রোহের অজানা ইতিহাস*, পৃ. ৪৬
[৪৬] *নীল বিদ্রোহের নানাকথা* , পৃ. ৬৯।
[৪৭] *কুষ্টিয়ায় ইসলাম*, পৃ. ১৮৫ ; *নীল বিদ্রোহের নানাকথা* , পৃ. ৮৯-৯০।
[৪৮] J.H.E.Garrett, *Bengal District Gazetteer, Nadia District,* p.34-35 ; *কুষ্টিয়ায় ইসলাম*, পৃ. ১৮৫।
[৪৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৫-১৮৬ ; *নীল বিদ্রোহের নানাকথা* , পৃ. ঃ-৮৯-৯০।
[৫০] *বাংলাপিডিয়া*, ৫ম খ, পৃ. ১৪৫।
[৫১] সাধারণত বিদ্রোহীরা রাত্রিতে মহিষের শিঙ্গা ধ্বনিতে সকলে একত্রিত হত। মাছ ধরার ছলে সকলে স্কন্ধে একখানা লাঠির অগ্রভাগে একটি পলো নিয়ে বহু লোক একত্রে যাতায়াত করত। এজন্য এ বিদ্রোহ 'পলো বিদ্রোহ' এবং বিদ্রোহীগণ পলোয়ালা বা পলোনাথ কোম্পানি নামে অভিহিত হত। দ্র. *পাবনা জেলার ইতিহাস* , ৩য় খ, পৃ. ১৬৪ ; *চলনবিলের ইতিকথা*, পৃ. ১৮৬ ; *দৈনিক জনকণ্ঠ*, বর্ষ ১৬, সংখ্যা ১৯৯, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০০৮।
[৫২] প্রাগুক্ত, *পাবনা জেলার ইতিহাস*, ৩য় খ, পৃ. ২৩২ ।
[৫৩] *চলনবিলের ইতিকথা*, পৃ. ১৮৬-৮৭ ; *পাবনা জেলার ইতিহাস* , ৩য় খ, পৃ. ২৩২ ; *পাবনা জেলার ইতিহাস* , ৬ষ্ঠ খ, পৃ. ৬৮০ ।
[৫৪] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, বর্ষ ১৬, সংখ্যা ১৯৯, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০০৮।
[৫৫] W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal,* V0L-IX, Districts of Murshidabad and Pabna, (London : 1875), P.-319-320 ; *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার পাবনা*, পৃ. ৪৪-৪৫ ; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, চতুর্দশ খ, পৃ. ৪২২।
[৫৬] *পাবনা জেলার ইতিহাস* , ৩য় খ, পৃ. ২২৯।
[৫৭] *পাবনা জেলার ইতিহাস* , ৩য় খ, পৃ. ২৩০।
[৫৮] *শতবর্ষ স্মরণিকা* , পৃ. ৩০ ; *দৈনিক জনকণ্ঠ*, বর্ষ ১৬, সংখ্যা ১৯৯, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০০৮।